বাংলাদেশে গণতন্ত্র ঃ গবেষকের দৃষ্টিকোণ

এমাজউদ্দীন আহমদ*

গবেষণার লক্ষ্য

অজানাকে জানা, অচেনাকে সঠিকভাবে চেনাই গবেষকের মূল লক্ষ্য। বিদ্যমান জ্ঞানভাণ্ডারে কিঞ্চিৎ হলেও সংযোজন করার লক্ষ্যেই গবেষণা। যা জানি তাকে আরো ভালভাবে জানা, যা জানি না তার চারপাশ থেকে জমাট বাঁধা অন্ধকারের দেয়ালটাকে সরিয়ে আলোর পথকে সহজ করার লক্ষ্যে আমরা গবেষণার শত বাতায়ন উন্মুক্ত করি। বিভ্রান্তির জটিল জালে কোন বিষয় জড়িয়ে পড়লে তার নিরসন, ভুল তথ্যের আবরণে ঢাকা পড়লে তার উন্মোচনও এর অন্তর্গত। এসব কারণে সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে গবেষণা এতো গুরুত্বপূর্ণ।

বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ করে গবেষক সংগ্রহ করেন রাশি রাশি উপাত্ত। তারই ভিত্তিতে রচনা করেন তত্ত্ব। ব্যাখ্যা দানে, কোন কোন সময় সামাজিক দিক নির্দেশে, তত্ত্বভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষক সমৃদ্ধ করেন তাঁর ক্ষেত্র। সামাজিক সমস্যার গভীর অরণ্যে তাই দক্ষ শিকারীর মতো সার্থক গবেষকের অবদান তাৎপর্যপূর্ণ।

গবেষক খোঁজেন উপাত্ত, নির্ভরযোগ্য এবং বাস্তবভিত্তিক রাশি রাশি উপাত্ত। সংগৃহীত উপাত্তের মাধ্যমে তিনি তাঁর অনুমানকে (hypothesis) প্রমাণ করেন। তাঁর অনুমান প্রমাণিত না হলে নতুনভাবে অনুমান সংগঠন করে আবারো শুরু করেন যাত্রা। এমনি সব উপাত্তের দিকে তার দৃষ্টি যা প্রমাণ করা সম্ভব। নিজের আবেগ, মানসিক প্রবণতা, ব্যক্তিগত পছন্দ–অপছন্দের রঙীন চশমা খুলে ফেলে তাঁকে তাকাতে হয় বাস্তবতাভিত্তিক, প্রমাণযোগ্য, কঠিন উপাত্তের দিকে।

এদিক থেকে বলা যায়, গবেষণা হলো সীমাহীন সমুদ্রে একধরনের অভিযাত্রা। সে সমুদ্রে গবেষক নিঃসঙ্গ নাবিক। বুকে তার অন্তহীন সাহস। চোখে অযুত সূর্যের দৃষ্টি। মন্থন করে চলেছেন চারদিক। লক্ষ্য তাঁর সীমাহীন জলরাশির ওপারে নতুন এক পৃথিবীর আবিষ্কার। চারদিকে অন্ধকার - অনিশ্চয়তায় ভরা। শুধু ভরসা, বিজ্ঞানসম্মত সুনির্দিষ্ট

*অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পদ্ধতি এবং নির্ভরযোগ্য উপাত্ত। এইটি তাঁর কম্পাস যেন। তাঁর জন্যে দিকনির্দেশকারী যন্ত্র।

গবেষণার সমস্যা

সর্বক্ষেত্রে গবেষণার পথ বড়ো দুর্গম। সামাজিক বিজ্ঞানের বৃহত্তর ক্ষেত্রে, বিশেষ করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তা আরো জটিল। গবেষণাগারে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীরা যেভাবে তাঁদের গবেষণার ক্ষেত্রকে সীমিত এবং নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন সামাজিক বিজ্ঞানীদের সে সুযোগ নেই। সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গবেষণার মৌল একক ব্যক্তি এবং ব্যক্তি সমন্বয়ে সমষ্টি। তারই ভিত্তিতে সমাজবিজ্ঞানীদের অগ্রসর হতে হয়। ফলে ব্যক্তির আবেগ, সমষ্টির উন্মাদনা, স্থান ও কালের প্রভাব, সংস্কৃতির প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল দ্যোতনা – সব কিছুকে গবেষক গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন। এসব লক্ষ্য করে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছিলেন, পদার্থবিদ্যার চেয়ে রাজনীতির গবেষণা ক্ষেত্র। অনেক বেশী জটিল।

আচরণবাদ জনপ্রিয় হবার ফলে সংখ্যাভিত্তিক উপাত্ত ব্যবহৃত হচ্ছে বটে, কিন্তু সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্র এতো বিশাল এবং এতো অনিশ্চিত যে ব্যক্তির সব প্রবণতা, সমষ্টির সকল কার্যক্রম এবং আচরণের সংখ্যাগত প্রকাশ সম্ভব নয়। বেশ ক'বছর থেকে সামাজিক বিজ্ঞানের বৃহত্তর ক্ষেত্রে বহুসংখ্যক প্রয়োগযোগ্য নতুন নতুন পদ্ধতি অনুশীলন করা হচ্ছে। সিস্‌টেমস্‌ তত্ত্ব থেকে শুরু করে মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণও ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু চুলচেরা বিশ্লেষণের জন্যে ইতিহাসের বিশাল গবেষণাগারকে সামনে রেখে, সুনির্দিষ্ট পরিসরে তুলনামূলক পর্যালোচনার উপর গুরুত্ব এতোটুকু কমেনি। ইতিহাসের পরীক্ষা–নিরীক্ষার উপর তাদের আস্থা বিন্দুমাত্র কমেনি। প্রাচীনকালে এরিস্টটল যেভাবে ইতিহাসের উপর নির্ভর করেছেন, সে নির্ভরশীলতা এযুগেও প্রায় তেমনি।

ইতিহাসের গতিধারা সম্পর্কেও সম্প্রতি কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। মার্কিন গবেষক ফুকুয়ামা (Francis Fakuyama) ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত এক নিবন্ধে বলেছেন, মানুষের আদর্শগত বিবর্তনের চূড়ান্ত পর্যায় এসে গেছে। এক্ষেত্রে ইতিহাসও তার চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত। পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক গণতন্ত্রই এখন সার্বজনীন রাজনৈতিক ব্যবস্থা রূপে প্রকাশিত।[১] সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়কে তিনি এভাবে অভিনন্দিত করেন। তাঁর মতে, ইতিহাস তার চূড়ান্ত লক্ষ্য স্পর্শ করেছে।

ফুকুয়ামার আবেগ বিজড়িত ব্যক্তব্যের উপর আস্থা নাই বা রাখলেন, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে ইতিহাস যে পথ নির্দেশক নয়, তা স্বচ্ছন্দে বলা যায়। যারা বলেন, 'ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে' ('History repeats itself') তারা ঠিক কথা বলেন না। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে না। অসংখ্য ঘটনার মধ্যে মাঝে মাঝে দু'চারটির অবয়বে মিল দেখা যেতে পারে, কিন্তু পুনরাবৃত্তি কোথায়?

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের অগ্নিকুন্ড থেকে বাংলাদেশের উত্তরণ ঘটলে জনসমষ্টির মধ্যে গণতন্ত্রের আবেদন যেমন হয়ে ওঠে সর্বগ্রাসী, নব্বই–এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের পরেও তেমনি এ সমাজে গণতন্ত্রের আবেদন হয় আকাশচুম্বি। মুক্তিযুদ্ধের পর জনগণের প্রত্যাশা যেমন ছিল সীমাহীন, স্বৈরাচারের পতনের পরে জনসমষ্টির প্রত্যাশা তেমনি হয় অন্তহীন। মুক্তিযুদ্ধের পরে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রবর্তিত হয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। প্রভাবশালী সংসদের নিকট দায়িত্বশীল মন্ত্রিপরিষদ হয়ে ওঠে রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রধান নিয়ামক। সে ব্যবস্থা এ সমাজ ধরে রাখতে পারেনি।

স্বৈরাচারমুক্ত বাংলাদেশেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সংসদীয় ব্যবস্থা। 'সার্বভৌম' সংসদের নিকট দায়ী মন্ত্রিপরিষদই নির্বাহী কর্তৃত্বের অধিকারী। বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ কি? তেমনি কি অন্ধকার? সামরিক বাহিনী যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করবে ১৯৭২–৭৫ কালীন বাংলাদেশে তা কেউ ভাবেন নি। বাংলাদেশের রাজনীতি বিশ্লেষণকারী দেশী এবং বিদেশী কোন লেখকই এমন আশঙ্কা করেন নি। দক্ষিণ এশিয়ায় সামরিক বাহিনীর কাঠামো, কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ এবং ক্রমবিবর্তন পর্যালোচনা করে যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা বিশ্লেষক স্টিফেন কোহেন (Stephen Cohen) বরং বলেছিলেন, বাংলাদেশ রাজনীতির ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপের আশঙ্কা নেই।[২] কিন্তু তা ঘটলো, এবং অকস্মাৎ ঝড়ের বেগে।

নব্বই এর দশকে আর যাই হোক এ সম্পর্কে সবাই সচেতন। বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী সম্পর্কে এরই মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে বহুসংখ্যক বিশ্লেষণাত্মক কর্ম। প্রকাশিত হয়েছে বহু সংখ্যক গ্রন্থ এবং প্রবন্ধ।[৩] তার পরেও কি কিছু বলা যায়? গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিধ্বস্ত হতে পারে বাইরে থেকে। ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ভেতর থেকে। এদেশে গণতন্ত্রের শত্রু অনেক। এদেশে গণতন্ত্রের মিত্র শুধুমাত্র জনগণের সংগ্রামী চেতনা।

বাংলাদেশে গণতন্ত্রের গতি স্তব্ধ হয়েছে বিরোধী দল কর্তৃক। গণতন্ত্র নিষ্প্রাণ হয়েছে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের দ্বারা। গণতন্ত্রের কন্ঠরুদ্ধ হয়েছে সামরিক এবং বেসামরিক আমলাদের দ্বারা। প্রত্যক্ষভাবে হত্যা এবং ক্যু'এর মাধ্যমে, সামরিক বাহিনীর দ্বারা। এদেশে সত্যি গণতন্ত্রের শত্রু অনেক। সমস্যা জর্জরিত বাংলাদেশের প্রায় দুই–তৃতীয়াংশ জনসমষ্টি বাস করে দারিদ্র্যসীমার নিম্নে। প্রায় তিন–চুতর্থাংশ জনসমষ্টি অক্ষরজ্ঞানহীন। যে তারুণ্যের ঔদ্ধত্যে জাতি হতে পারে অগ্রসরমান তারা হতাশাগ্রস্ত, বেকারত্বের অভিশাপে অভিশপ্ত। এসব সমস্যা একদিনে সৃষ্টি হয়নি। এদের সমাধানও আসবে না অল্প সময়ে। কিন্তু এসব সমস্যা এত গভীর এবং এতো ব্যাপক যে, এদের যে কোনটির বিস্ফোরণে গণতন্ত্র কেন, সামাজিক স্থিতিশীলতা পর্যন্ত বিনষ্ট হতে পারে। সমাজ জীবনের আদি অকৃত্রিম বন্ধন পর্যন্ত শিথিল হতে পারে।

এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে গবেষণা এক চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। এগোতে হবে অতি সন্তর্পণে, নৈপুণ্যের সাথে। এ প্রসঙ্গে গবেষককে কয়েকটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বিষয়বস্তুকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। আবেগ দিয়ে নয়, বরং

যুক্তিবাদিতার শক্ত মাটিতে পা রেখে অগ্রসর হতে হবে। মনকে আলোড়িত করতে হবে হাজারো প্রশ্নের ঢেউয়ে। গণতন্ত্র কি? একি শুধু সরকার ব্যবস্থা? শাসন–প্রশাসন? নির্বাচিত প্রতিনিধি কর্তৃক সরকার পরিচালনা? যে যে সমাজে গণতন্ত্র স্থিতিশীল রয়েছে ঐ সব ক্ষেত্রে গণতন্ত্র শুধু সরকার পরিচালনার বিশিষ্ট ঢং নয়, তা অনেকটা জীবনপ্রণালী, একধরনের সংস্কৃতি, সমাজজীবনের পরিশীলিত মনমানসিকতা। বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সম্ভাবনাময় জয়যাত্রাকে অর্থপূর্ণ করার জন্যে গবেষককে এদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। দৃষ্টি দিতে হবে ঐ সব সামাজিক এবং অর্থনৈতিক শর্তের দিকে যা গণতন্ত্রের শুধুমাত্র সূচকই নয়, গণতন্ত্রের রক্তকণিকাও। কি কি কারণে গণতন্ত্র বিধ্বস্ত হয়? বাংলাদেশে অতীতে এসব কারণ কিভাবে গণতন্ত্রকে অচল করে তুলেছিল? এসব প্রশ্নের ব্যাখ্যা করতে হবে। বিশ্লেষণ করতে হবে ভবিষ্যতকে সামনে রেখে। শুধু তার রাজনৈতিক অভিব্যক্তি নয়, তার সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দিকের। তার নান্দনিক প্রকৃতিরও।

গণতন্ত্র কি?

গণতন্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ democracy। democracy শব্দটির প্রথম প্রয়োগ হয় খৃষ্টপূর্ব পাঁচ শতকে। জনগণের শাসন– এ অর্থে প্রয়োগ করেন গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোডোটাস (Herodotus)। মূলগত অর্থে democracy আসে 'demos' (জনগণ) এবং 'Kratein' বা 'Kratia' (শাসন বা ক্ষমতা) থেকে। ইংরেজি ভাষায় democracy শব্দটির প্রথম প্রয়োগ হয় ষোল শতকে। ফরাসী শব্দ democratie থেকে এসেছে ইংরেজি শব্দ democracy। যদিও এর মূল গ্রীক শব্দদ্বয় 'demos' এবং 'Kratein'। সেই থেকে গণতন্ত্র বা democracy এর ব্যবহার। এথেন্সের খ্যাতনামা রাজনীতিবিদ পেরিক্লিস (Pericles) বলেছেনঃ "আমাদের শাসনকে গণতন্ত্র বলে চিহ্নিত করি এজন্যে যে, শাসন ব্যবস্থার দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে বহুজনের উপর, কতিপয় ব্যক্তির উপর নয়" ('We are called a democracy because the administration is in the hands of the many and not in the few')।[৪]

একই সুরে এরিস্টটল তাঁর Politics গ্রন্থের চতুর্থ অংশের ষাট অনুচ্ছেদে বলেনঃ "সাধারণভাবে আমরা বলতে পারি, যে ব্যবস্থায় প্রত্যেকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়নি তা কুলীনতন্ত্র এবং যেখানে প্রত্যেকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে তা গণতন্ত্র" ('We may lay down generally that a system which does not allow every citizen to share is oligarchical and that one which does so is democratic.)।[৫] প্রায় প্রতিনিয়ত উদ্ধৃত আব্রাহাম লিঙ্কনের (Abraham Lincoln) সংজ্ঞাও অনেকটা তেমনি। তিনি তাঁর দু'মিনিটকাল স্থায়ী ১৮৬৩ সালের ১৯ নভেম্বরে প্রদত্ত গ্যাটিসবার্গ বক্তৃতায় বলেনঃ "জনগণের সরকার, জনগণের দ্বারা পরিচালিত সরকার এবং জনগণের স্বার্থে পরিচালিত সরকার পৃথিবী থেকে মুছে যাবে না।" ("That Government of the People, by the People, for the People, shall not perish from the earth.)।

এসব সংজ্ঞা ছাড়াও, বিভিন্ন লেখক গণতন্ত্রকে চিহ্নিত করেছেন বিভিন্ন রূপে। কেউ বলেছেন গনতন্ত্র "সম্মতির সরকার" ('government by consent') । কেউবা বলেছেন, গণতন্ত্র "জনগণের সার্বভৌমত্ব" ('sovereignty of the people') । কারো মতে, গণতন্ত্র "সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন" ('rule by the majority') । কেউ আবার গণতন্ত্রকে চিহ্নিত করেছেন "সীমিত সরকার রূপে" ('limited government')।[৬] এসবই গণতন্ত্রের সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা। অতি সংক্ষেপে, গণতন্ত্র এমন এক সরকার ব্যবস্থা যেখানে জনগণ নিজেদের শাসন করে।

এসব সংজ্ঞায় গনতন্ত্রের মর্মবাণী অনুরণিত হয় বটে, কিন্তু গণতন্ত্রের অবয়ব সুস্পষ্ট হয় না। সংক্ষিপ্ত ঐসব ব্যাখ্যায় গনতন্ত্রের অন্তঃকরণ স্পর্শ করা যায় বটে, কিন্তু গণতন্ত্রের আকার-প্রকার সম্পর্কে কিছুই বোঝা যায় না। যে কোন একটির বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হলে অন্তর্নিহিত বিভ্রান্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ধরা যাক, গণতন্ত্র 'জনগণের শাসন'। প্রকৃতপক্ষে জনগণ কোথাও শাসন করেনি, এবং করে না। জনগণের শাসন করার ক্ষমতাও নেই। পেরিক্লিস জনগণের শাসন সম্পর্কে আবেগ জড়িত কণ্ঠে বিবৃতি দিলেও তিনি জানতেন, জনগণ বলতে যা বোঝায় তারা কোন সময়ে শাসন কাজের সাথে জড়িত ছিলেন না। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর এথেন্সের দিকে তাকালেই চলবে।

তখন এথেন্সের জনসংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ। জনসমষ্টির প্রায় অর্ধেকই ছিল ক্রীতদাস এবং যুদ্ধবন্দী। ক্রীতদাসদের শাসন পরিচালনা ক্ষেত্রে ছিল না কোন অধিকার। শাসনকাজ পরিচালনায় কোন অধিকার ছিল না মহিলাদের। তারা ছিলেন মুক্ত জনসমষ্টির প্রায় অর্ধেক। সমাজে শিশু-কিশোরদের অংশও প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। ফলে হিসেব করে দেখা গেছে, এথেন্সের প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা ছিল হাজার দশেকের মতো। এরিস্টটলের কথায়, "তাঁরাই ছিলেন এথেন্সের নাগরিক।" নাগরিকদের প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রকে পেরিক্লিস বলেছেন, "জনগণের শাসন"।

বলা হয়, গণতন্ত্র "সম্মতির শাসন ব্যবস্থা," "সম্মতিভিত্তিক সরকার"। এ শব্দগুলোকে বিশ্লেষণ করলেও দেখা দেবে অসংখ্য অসঙ্গতি। প্রশ্ন উঠবে – কাদের সম্মতি নিয়ে সরকার? কোন বিষয়ে সম্মতি? কতদিনের জন্যে সম্মতি? কারা সম্মতি নেবেন? কাদের সম্মতি? এই বিভ্রান্তির মধ্যে সম্মতির সরকার হিসেবে গণতন্ত্রের রূপরেখা হয়ে ওঠে অত্যন্ত অস্পষ্ট।

ডেভিড হেল্ড (David Held) বলেন, গণতন্ত্র সম্পর্কে দুটি ঐতিহাসিক সত্য সর্বজনগ্রাহ্য।[৭] গণতন্ত্রের তাত্ত্বিক ভিত্তি এবং কার্যকারিতা সম্পর্কে প্রাচীন কাল থেকেই দার্শনিক এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ বিরূপ মন্তব্য করেছেন। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো (Plato) গণগতন্ত্রকে "মুর্খের শাসন" বলে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে, যে কোন সমাজে তাদের সংখ্যাই বেশি। গ্রীক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এরিস্টটলের মতে, গণতন্ত্র "নিম্নস্তরের" শাসন ব্যবস্থা। এমিল ফাগুয়ে (Emile Faguet) গণতন্ত্রকে বলেছেন, "অক্ষমতার

প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ"। আধুনিককালের ট্যালির‍্যান্ড গণতন্ত্রকে চিহ্নিত করেছেন "মন্দ লোকদের সরকার" রূপে ('Government of the blackguards')।

গণতন্ত্র যে উৎকৃষ্ট সরকার ব্যবস্থা এ সম্পর্কে ঐকমত্য হয়েছে এইতো সেদিন, মাত্র চার পাঁচ দশক আগে, এবং তাও এমনভাবে যে, গণতন্ত্র না হলে কোন সরকার বৈধ সরকার হিসেবে স্বীকৃত হবে না। আজকাল ডান, কেন্দ্র, এমনকি বাম থেকেও গণতন্ত্রের প্রশংসায় সবাই মুখর। সকলেই এখন হয়েছেন গণতন্ত্রের সমর্থক। সবাই গণতন্ত্রী। সমাজতন্ত্রের প্রবক্তারাও এখন গণতন্ত্রকে সেরা ব্যবস্থা বলতে শুরু করেছেন। গণতন্ত্রী হওয়াই এখন কাম্য পদক্ষেপ। বিধি–বিধান, নীতি–সিদ্ধান্ত সবই বৈধ যদি তা গণতন্ত্রীদের দ্বারা প্রণীত হয়। আজকাল গণতন্ত্র হয়েছে চমকপ্রদ এক আবরণ। এ আবরণে ঢাকা পড়লে নিয়মহীনতা, এমন কি নীতি বিগর্হিত কাজকর্মও বৈধ হয়ে ওঠে।

আর একটি ঐতিহাসিক সত্য হলো আদর্শ হিসেবে গণতন্ত্রের প্রাচীনতা। মানবের আশা–আকাঙ্ক্ষায় গণতন্ত্র বরাবরই বিদ্যমান। আড়াই হাজার বছর পূর্বে গ্রীসের প্রাজ্ঞ লেখকদের লেখাজোখায় গণতন্ত্রের উল্লেখ রয়েছে। তাঁদের লেখায় সমাজতন্ত্রের কথাও রয়েছে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো মাত্র সেদিন, ১৯১৭ সালে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় তার কিছু দিন পূর্বে। রবার্ট ডালের (Robert Dahl) মতো রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রই প্রথম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।[৮] কেউ কেউ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বৃটিশ শাসনব্যবস্থাকেও গণতান্ত্রিক বলতে চান, যদিও উভয় ক্ষেত্রেই গণতন্ত্র ছিল অসম্পূর্ণ, কেননা মহিলাদের ভোটাধিকার কোনটিতে স্বীকৃত হয়নি। তাছাড়া, আমেরিকায় নিগ্রোদেরও তখন ছিল না ভোটাধিকার।

সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি কর্তৃক পরিচালিত ব্যবস্থা গণতন্ত্র বলে চিহ্নিত হলে বলা যায়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিশ শতকের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। উনিশ শতকের শেষ দিকে (১৮৯৩ সালে) শুধুমাত্র নিউজিল্যান্ডে মহিলাদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়। অষ্ট্রেলিয়ায় মহিলাদের ভোটাধিকার দেওয়া হয় ১৯০২ সালে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ১৯২০ সালে, বৃটেনে ১৯২৮ সালে। ফ্রান্সে এবং বেলজিয়ামে নারীরা এই অধিকার লাভ করেন ১৯৪৭ সালে। সুইটজারল্যান্ডে এ অধিকার স্বীকৃত হয় ১৯৭১ সালে। এদিক থেকে বলা যায়, রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে গণতন্ত্র প্রাচীনতম। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কিন্তু সাম্প্রতিককালের, এক অর্থে বিশ শতকের।

গণতন্ত্র সম্পর্কে বিভ্রান্তির মূলে রয়েছে মূলত দুটি কারণ ঃ

(এক) গণতন্ত্রের সংজ্ঞা নির্দেশ এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকর করার শর্তকে অনেক সময় এক ও অভিন্ন করে দেখা হয়, যদিও দুয়ের মধ্যে রয়েছে আকাশ ও পাতাল পার্থক্য। গণতন্ত্রকে জনগণের শাসন বলে সংজ্ঞায়িত করা সহজ হলেও জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্যে সমাজব্যবস্থায় যে সব শর্তের প্রয়োজন তা চিহ্নিত করা তেমন সহজ নয়। একটি আদর্শ, অন্যটি

বাস্তাবতাভিত্তিক। আদর্শ হিসেবে যুগ যুগ ধরে গণতন্ত্র মানব মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। পশ্চিম আকাশে মোহনীয় রঙীন আভার মতো বরাবর সামাজিক মানুষকে হাতছানি দিয়েছে। বাস্তবে কিন্তু খুব কম সমাজই গণতন্ত্রের জন্যে প্রস্তুত হতে পেরেছে। তাই আদর্শের সাথে বাস্তবতার যে অসংগতি গণতন্ত্রের সংজ্ঞায় তাই প্রতিফলিত হয়ে ওঠে।

(দুই) আজ পর্যন্ত, গণতন্ত্রের সুনির্দিষ্ট রূপ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। তাই সব সময় কোন না কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রেক্ষাপটে গণতন্ত্রের কথা বলা হয়ে থাকে। গণতন্ত্রের সর্বজনগ্রাহ্য কোন কাঠামো নেই। নেই এর সর্বজনস্বীকৃত কোন রূপ। গণতন্ত্র সম্পর্কে তাই জানতে হলে গবেষকদের তাকাতে হয়েছে পুরনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দিকে, হয় বৃটিশ ব্যবস্থার দিকে, নয়তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন পদ্ধতির দিকে। এসব কারণে কোন কোন গবেষক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে গণতন্ত্র না বলে উল্লেখ করেছেন বহুকেন্দ্রিক ব্যবস্থারূপে (Polyarchy)। বহুকেন্দ্রিক ব্যবস্থার রূপরেখা নির্দেশ করা সম্ভব। তাঁদের মতে সম্ভব নয় গণতন্ত্রের আদর্শ কাঠামো বিনির্মাণ।

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পূর্বশর্ত হিসেবে রবার্ট ডাল (Robert Dahl) সাতটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপের বিবরণ দিয়েছেন। শাসন ব্যবস্থায় এদের উপস্থিতি ঘটলে যে ব্যবস্থাকে গণতন্ত্র বলে চিহ্নিত করা যায়।[৯] শর্তগুলো নিম্নরূপ ঃ

(এক) সরকার পর্যায়ে নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার সাংবিধানিকভাবে নির্বাচিত কর্মকর্তাদের উপর ন্যস্ত হয়েছে।

(দুই) কর্মকর্তা নির্বাচন এবং অপসারণের লক্ষ্যে নিয়মিত সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনঅনুষ্ঠান।

(তিন) নির্বাচনে প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তির ভোটাধিকারের নিশ্চয়তা বিধান।

(চার) শাসনকার্য পরিচালনার জন্যে অধিকাংশ বয়স্ক ব্যক্তির নির্বাচনে প্রার্থী হবার সুযোগ।

(পাঁচ) বাক–স্বাধীনতার নিশ্চয়তা, সরকার এবং সরকারী কর্মকর্তাদের কার্যধারা পর্যালোচনা ও সমালোচনা তথা আর্থ–সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার সমালোচনা ক্ষেত্রে নাগরিকদের স্বীকৃত অধিকার।

(ছয়) রাষ্ট্র এবং সমাজ সংক্রান্ত তথ্য এবং তথ্যের উৎস এমনভাবে পরিচালিত যে তার উপর সরকার বা বিশেষ সুবিধাভোগী কোন গ্রুপের একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

(সাত) সংঘ, সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠান রচনায় নাগরিকদের অধিকারের স্বীকৃতি, যার মাধ্যমে তারা বিকল্প সরকার গঠনে অথবা বর্তমান সরকারকে নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হয়।

এসব প্রক্রিয়া কোন সমাজে কার্যকর থাকলে বুঝতে হবে ঐ সমাজ গণতন্ত্রের ক্ষেত্র তৈরী করেছে। গণতন্ত্রের পথে চলতে শিখেছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকর করার মনমানসিকতা অর্জন করেছে। অভিজ্ঞতার পশরা জমিয়ে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি সমৃদ্ধ করছে। সামাজিক স্বাতন্ত্র্য এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার মানদণ্ডে যাচাই করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ফ্রিডম হাউজ (Freedom House) তার ১৯৯০ সালের বার্ষিক রিপোর্টে বলেছে, তদানীন্তন বিশ্বের ১৬৭টি রাষ্ট্রের মধ্যে ৬১টি গণতান্ত্রিক পন্থা বেছে নিয়েছে। এসব রাষ্ট্রে বসবাস করছেন বিশ্বের প্রায় ৩৯ শতাংশ জনসমষ্টি।

এই হিসেবও এখন পুরনো হয়ে গেছে। এর মধ্যে জার্মানী একীভূত হয়েছে। পূর্ব ইউরোপে গণতন্ত্রের প্রসার ঘটেছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন বিচ্ছিন্ন হয়ে তার প্রত্যেকটি প্রজাতন্ত্র গণতন্ত্রের পথে পা বাড়িয়েছে। বাল্টিক রাষ্ট্রগুলো দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলেছে। দক্ষিণ আমেরিকার যে সব রাষ্ট্রে স্বৈরাচার রাজত্ব করছিল তাদের অনেকগুলোয় সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আফ্রিকার সেনেগাল, গ্যাবন, কঙ্গো, এঙ্গোলা, এমন কি দক্ষিণ আফ্রিকায় পর্যন্ত অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল শিথিল হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও নেপালে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দক্ষিণ–পূর্ব এবং পূর্ব এশিয়ায় গণতন্ত্রের স্রোত প্রবল হয়েছে। তাইওয়ান থেকে মঙ্গোলিয়া পর্যন্ত গণতন্ত্রের তীব্র ঢেউ অনুভূত হচ্ছে। আগামী দশকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাবে।

একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কিন্তু অন্যটি থেকে স্বতন্ত্র। কোন একটি আর একটির হুবহু নকল নয়। প্রত্যেকটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট, আপন আপন আলোকে ভাস্বর। কোথাও রয়েছে আইন পরিষদের প্রাধান্য, কোথাও বা নির্বাহী বিভাগের। কোথাও নির্বাহী কর্তৃত্ব প্রয়োগ করেন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সংগঠিত মন্ত্রি পরিষদ, কোথাও রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে গঠিত উপদেষ্টা পরিষদ। কোন কোন রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত। কোথাও তিনি সংসদ সদস্য কর্তৃক নির্বাচিত। কোথাও বা উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা প্রাপ্ত। সবগুলোই কিন্তু গণতান্ত্রিক। কোনটির প্রকার সংসদীয়, কোনটির রাষ্ট্রপতিক। কোনটি যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির ভিত্তিতে সংগঠিত, কোনটি এককেন্দ্রিক। গণতান্ত্রিক নীতির ক্ষেত্রে কিন্তু তারতম্য নেই। কোনটি বেশি গণতান্ত্রিক এবং কোনটি কম – এ প্রশ্ন অবান্তর।

বাংলাদেশে গণতন্ত্র

বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ কি? এ সম্পর্কে কিছু বলার আগে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ইতিহাস মনে রাখা প্রয়োজন। আজকে বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের প্রসার যেভাবে ঘটছে তাতে উল্লসিত হবার কারণ রয়েছে বটে, কিন্তু গণতন্ত্রের ইতিহাসের প্রতিবাঁকে রয়েছে হতাশা এবং ব্যর্থতার অসংখ্য বালুচর। মানব ইতিহাসের দীর্ঘকালীন পরিসরে, বিশেষ করে আঠার শতকের শেষপ্রান্তের ফরাসী বিপ্লব থেকে শুরু করে বিশ শতকের মাঝামাঝির এক–দলীয় ব্যবস্থা পর্যন্ত হিসেব করলে দেখা যায়, গণতান্ত্রিক সরকার একদিকে যেমন অত্যন্ত অল্প সংখ্যক, অন্যদিকে তেমনি স্বল্পকালীন। অধ্যাপক ফিন (Chester E. Finn. Jr) সত্যই বলেছেন, "গণতন্ত্রের ধারণা দীর্ঘকালীন বটে, এর কার্যকারিতা কিন্তু অনিশ্চিত" (`The idea of democracy is durable, but its practice is precarious')।[১০]

অধ্যাপক ফিনের বক্তব্য প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। গত পঞ্চাশ বছরে গণতান্ত্রিক সরকারগুলোর কার্যকারিতা পর্যালোচনা করলেই চলবে। জার্মানী, অস্ট্রিয়ার মতো বহু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র একদলীয় ব্যবস্থার কঠোর নিয়ন্ত্রণে এসেছে। অন্যদিকে ঔপনিবেশিকতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে বহু জনপদ গণতন্ত্রের মিছিলে সামিল হয়েছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা মাথায় নিয়ে যাত্রা শুরু করে অনেক রাষ্ট্র প্রবেশ করেছে স্বৈরাচারী সামরিক শাসনের অচলায়তনে। বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ইতিহাসও তেমনি হতাশাব্যঞ্জক, ২২ বছরের ইতিহাসে বাংলাদেশ লাভ করেছে মাত্র সাত কি আট বছরের গণতান্ত্রিক শাসন। তাই প্রশ্নটি জটিল বটে – এদেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ কি?

গণতন্ত্র শুধু শাসন পদ্ধতি নয়, গণতন্ত্র সামাজিক নর্ম এবং রীতিনীতিও। গণতন্ত্র একধরনের সমষ্টিগত সংস্কৃতিও। গণতন্ত্রের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্যে তাই রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শুধুমাত্র কাঠামোগত পরিবর্তনই যথেষ্ট নয়। এজন্যে প্রয়োজন সামাজিক ব্যবস্থার সঠিক বিন্যাস। প্রয়োজন সামাজিক কার্যক্রমে নাগরিকদের একধরনের মনমানসিকতা। ডায়ান রেভিচের (Diane Ravitch) মতে, "গণতন্ত্র একগুচ্ছ প্রতিষ্ঠানের সমষ্টি মাত্র নয়। গণতন্ত্রের সুস্বাস্থ্য অনেকাংশে নির্ভর করে গণতান্ত্রিক পৌর সংস্কৃতির বিকাশের উপর।" (`Democarcy is more than the sum of its institutions. A healthly democracy depends in large part on the development of a democratic civic culture'.)।[১১]

সংস্কৃতিচেতনা প্রাণবন্ত না হলে গণতন্ত্র লাভ করে না তার কাঙ্ক্ষিত উচ্চতা। সংস্কৃতিবোধ জীবন্ত না হলে প্রবেশ করে না সমাজের গভীরে। জনগণের আশা–আকাঙ্ক্ষা ধারণ করে জনগণের নিজস্ব কর্মধারায় রূপান্তরিত হয় না। সংস্কৃতি যেমন ব্যক্তিকে ছাপিয়ে সমগ্রের হয়ে ওঠে এক পরিচয়ে, গণতন্ত্রও তেমনি ব্যক্তিকে কেন্দ্র করেই রূপান্তরিত হয় সমষ্টিগত কর্মপ্রবাহে। সংস্কৃতি দেয় পরিশীলিত এক দৃষ্টিভঙ্গী। গণতন্ত্র আনে সমাজ জীবনে সৃজনশীলতার এক দুর্বার প্রাণবন্যা। দুইই চলে পাশাপাশি,

হাত ধরাধরি করে। একটি পিছিয়ে পড়লে অন্যটি হাত বাড়ায় সহায়তার। হাত ধরে তোলে। পরস্পর পরস্পরের আলোকে পথ চলে।

দৈহিক বলের পরিবর্তে যুক্তি যখন কার্যকর হয় তখনি দেখা দেয় সংস্কৃতিচেতনা। পেশীর পরিবর্তে মস্তিষ্ক যখন হয়েছে চালিকাশক্তি তখনই সংস্কৃতির সূচনা হয়। দৈহিক বল আক্রমণ করে, অপরকে দূরে সরিয়ে রাখে। মন কিন্তু কাছে টানে, অপরকে আকর্ষণ করে। অপরের নিকট ছুটে যায়। এভাবেই সংস্কৃতির নব পর্যায়ে মানবের সংঘবদ্ধ জীবনের সূত্রপাত হয়। গড়ে ওঠে পরিবার, গোত্র, গোষ্ঠি, সংঘ এবং এক পর্যায়ে রাষ্ট্র। সহযোগিতার সোনালি বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মানব হয় সমাজবদ্ধ, সংহত। গণতন্ত্রের জন্ম ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় তারও পরে। সংস্কৃতি তখন উঠে এসেছে এক পরিণত পর্যায়ে।

সংস্কৃতি এবং গণতন্ত্র দুয়েরই শুরু ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে। ব্যক্তিজীবনকে সুন্দর ও সুরুচি সম্পন্ন করেই সংস্কৃতি হয়েছে অর্থপূর্ণ। ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশ ঘটিয়ে, ব্যক্তিকে সংকীর্ণতার অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়ে, সবার সাথে চলার এবং বলার জন্যে উপযোগী করে সংস্কৃতিই ব্যক্তির সামনে সম্ভাবনাময় উন্নত সামাজিক জীবনের সিংহদ্বার উন্মুক্ত করেছে। তেমনি গণতন্ত্রও ব্যক্তিকে তার ব্যক্তিত্বের সংকীর্ণ গুহা থেকে টেনে এনে মিলিয়েছে সমাজের বিস্তীর্ণ-উদার উপত্যকায়। তাই দেখা যায়, উন্নত সংস্কৃতির ঘাটেই ভিড়েছে সাম্য, সৌভ্রাতৃত্ব ও স্বাধীনতার পণ্যবাহী গণতন্ত্রের তরী। যে সমাজে সংস্কৃতির মান এখনও উন্নত হয়নি সেখানে গণতন্ত্রের যাত্রাপথ এখনও রয়েছে বন্ধুর, এখনো ভীষণ পিচ্ছিল।

বাংলাদেশ সমাজে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির মান অনেক অবনত। পারস্পরিক সন্দেহ এবং অবিশ্বাস জমাটবাঁধা পাথরের মতো আগলে রেখেছে সমষ্টিগত জীবনের মহামিলনের পথকে। ব্যক্তিগত এবং গোষ্ঠীগত স্বার্থের অন্ধকারে এখনও নিমজ্জিত সামগ্রিক স্বার্থের চেতনা। পেশীর সর্বগ্রাসী দাপটে নিস্তেজ হয়ে রয়েছে মস্তিষ্কের কল্যাণমুখী প্রত্যয়। আবেগের প্রবল স্রোতে ভেসে যাচ্ছে যুক্তিবাদিতার গণমুখী ভাবনা, সৃজনশীলতার সার্বিক কলাকৌশল। সবকিছু ভাঙার প্রবণতা নিঃশেষ করছে গড়ার প্রতিভাকে। "আমার" সুকৌশলী চিন্তাসূত্র প্রতিনিয়ত ছিন্ন করছে "আমাদের" ব্যাপকভিত্তিক কল্যাণবোধকে। সবাই চতুর। বিজ্ঞ হবার ক্ষেত্রে সবারই অনীহা। এ অবস্থা আর যাই হোক স্থিতিশীল গণতন্ত্রের জন্যে উপযোগী নয়।

গণতন্ত্রের জন্যে তাই ভাঙতে হবে সংকীর্ণতার দেয়াল। আত্মস্বার্থকে প্রক্ষিপ্ত করতে হবে সমগ্র সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে। গড়ে তুলতে হবে আত্মস্বার্থের ভিত্তিতে সামগ্রিক স্বার্থের উচ্চ সৌধ। কিন্তু পথ অত্যন্ত বন্ধুর। সুশিক্ষা হয়ত এ পথের দিশারী হতে পারতো, কিন্তু তাও এ সমাজে স্বল্প সংখ্যক জনসমষ্টির আয়ত্তে। শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত সমাজের বৃহত্তর অংশ। টমাস জেফারসন (Thomas Jefferson) লিখেছেনঃ কোন জাতি অজ্ঞতা মুক্ত হতে চাইলে তারা হতাশ হতে বাধ্য। সভ্যতার বৃহৎ অঙ্গনে তা কখনো ঘটেনি, ভবিষ্যতেও ঘটবেনা ("If a nation expects to be ignorant and

free, in a state of civilization, it expects what never was and never shall be)।[১২]

যে শিক্ষাব্যবস্থা সমাজে প্রচলিত রয়েছে তাও গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ ঘটানোর উপযোগী নয়। উপযোগী নয় বিশ্লেষণাত্মক মন গঠনের, নয় যুক্তিবাদী, আবেগবর্জিত পরিবেশে ব্যাখ্যাদানের। গণতন্ত্র কিন্তু চর্চার বিষয়। প্রতিনিয়ত পর্যালোচনার মাধ্যমেই গণতন্ত্রের শ্রীবৃদ্ধি হয়। অধ্যাপক ফিনের (Finn) কথায়, "ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের স্পৃহা নিয়েই মানুষ জন্মলাভ করে, কিন্তু যে সামাজিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা দীর্ঘকালীন পরিসরে ব্যক্তি এবং তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট স্বাধীনতাকে অর্থপূর্ণ করে তোলে তার জ্ঞান নিয়ে মানুষ জন্মে না। মানুষ জন্মলাভ করে, কিন্তু যে সামাজিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা দীর্ঘকালীন পরিসরে ব্যক্তি এবং তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট স্বাধীনতাকে অর্থপূর্ণ করে তোলে তার জ্ঞান নিয়ে মানুষ জন্মে না। মানুষকে তা অর্জন করতে হয়। তাকে শিখতে হয়।" ('People may be born with an appetite for personsal freedom, but they are not born with knowledge about the social and political arrangements that make freedom possible over time for themselves and their children . . . Such things must be achieved. They must be learned')।[১৩]

শুধু সাধারণ শিক্ষা নয়। নিজেদের প্রবণতা ও প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে আনার শিক্ষারও প্রয়োজন। হাজারো স্ববিরোধিতায় ভরা মানুষের মন। একদিকে সে চায় নিরাপত্তা, অন্যদিকে ছুটে চলে দুঃসাহসিক অভিযানে। ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যকে যতটুকু ভালবাসে, ঠিক ততটুকু আগ্রহী সামাজিক সাম্যের জন্যে। স্বাধীনতা উপভোগ করতে যতটুকু আগ্রহী, দায়িত্ব পালনে ঠিক তেমনি অনীহা। তাই দেখা যায় সমাজ জীবনের প্রতি ঘাটে জমে উঠেছে সংঘাত এবং ঐকমত্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব। এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতেই হবে। সামাজিক দ্বন্দ্বকে গণতন্ত্রের স্বার্থে রাখতে হবে সুনির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে। পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সমঝোতার স্বর্ণালী বন্ধনে ব্যক্তি এবং গ্রুপপর্যায়ে চরম প্রবণতাকে আবদ্ধ করতে হবে। বিভিন্ন সামাজিক গ্রুপগুলো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে যদি দাবী উপস্থাপন এবং দাবী আদায়ের মাধ্যম মনে করে তাহলে অভ্যন্তর থেকেই গণতান্ত্রিক সমাজ ধসে পড়বে। অন্যদিকে সমাজে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার জন্যে সরকার যদি গণকণ্ঠ রুদ্ধ করে অত্যধিক চাপ সৃষ্টি করে তাহলেও গণতান্ত্রিক সমাজ ভেঙে পড়বে, বাইরে থেকে।

গণতান্ত্রিক সমাজ এমন যান্ত্রিক নয় যে, একবার নীতি এবং প্রক্রিয়া রচিত হয়ে গেলে আপনা আপনি চলতে থাকবে। গণতান্ত্রিক সমাজ প্রাণবন্ত হয় যদি নাগরিকগণ আন্তরিকতার সাথে বিশ্বাস করেন – দ্বন্দ্ব যেমন অপরিহার্য, দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্যে ধৈর্য এবং সহনশীলতাও তেমনি অপরিহার্য। ব্যক্তি এবং ব্যক্তিসমন্বয়ে বিভিন্ন গ্রুপকে স্মরণে রাখতে হবে, অন্যের অধিকার এবং বক্তব্যও যথার্থ। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি এই ধরনের

সহনশীলতা এবং উদার মনোভাবের সৃষ্টি করে। তাই বলা হয়, গণতন্ত্রের বিকাশের জন্যে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি।

উন্নত গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি যে কোন গণতান্ত্রিক সমাজের বিশিষ্ট অর্জন। বাংলাদেশের সংস্কৃতি কিন্তু এ পর্যায়ে উন্নিত হয়নি। এদেশে গণতন্ত্র সবাইকে দিয়েছে দাবি উত্থাপনের অধিকার। সবাই সোচ্চার নিজ নিজ দাবির ক্ষেত্রে। এ দাবি মেটানো সম্ভব কি না তা ভাববার সময় নেই কারো। এ দাবি যে অন্যের স্বার্থের পরিপন্থী তাও ভাববার প্রয়োজন নেই। গণতন্ত্র এদেশে শুধুমাত্র অধিকার, এতোটুকু দায়িত্ব নয়। এদেশে গণতন্ত্র শুধুমাত্র আত্মস্বার্থের প্রতীক। সমষ্টিগত স্বার্থ গণতন্ত্রে এখনও স্থান পায়নি। সবাই নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যা অবলোকন করেন। অন্যের বক্তব্যও যে যথার্থ হতে পারে তা কেউ ভাবেন না। এমনি পরিস্থিতিতে গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়েছে এদেশে। চলতে গিয়েও তাই হোঁচট খাচ্ছে বার বার।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রকৃত শাসন হলো আইনের শাসন। কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের শাসন নয়। এক্ষেত্রে আইনের প্রাধান্যই বড়ো কথা। আইনের প্রণয়ন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সম্পন্ন হয় জনপ্রতিনিধি কর্তৃক, সংসদে। প্রণীত আইন মেনে চলা সবার জন্যে বাধ্যতামূলক। কোন আইন মন্দ হলেও তা মেনে চলতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত তা পরিবর্তিত না হচ্ছে।

অন্য কথায়, আইন সমাজে সব কিছুর নিয়ামক। সমাজে সকল শ্রেণী ও গ্রুপের স্বার্থ সংরক্ষণ করে আইন। পুরস্কার বা বঞ্চনা, পদোন্নতি বা পদচ্যুতি, লাভ বা লোকসান সবকিছুর নিয়ন্ত্রক আইন। ব্যক্তি, তা তিনি যত উঁচু পদে থাকুন না কেন, কাউকে কিছু দিতে অক্ষম বা কারো ক্ষতি সাধনেও সক্ষম। মোট কথা, গণতান্ত্রিক সমাজে শাসন হলো আইনের শাসন।

তাছাড়া, পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক সমাজের দিকে তাকালে সুস্পষ্ট দেখা যায়, সামাজিক উপত্যকা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে জারিত। সামাজিক উপত্যকা মোটামুটিভাবে সমতল। পীড়নমূলক স্তরবিন্যাসে সমাজজীবন তেমন অতীষ্ঠ নয়। সামাজিক ক্ষেত্রে একধরনের সাম্য সবার চোখে পড়ে। ফলে একজন অন্যজনকে ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধা করে। একজন অন্যের মতকে শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করে যদিও তা তার মত থেকে ভিন্ন। একজন অন্যের কাজকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে।[১৪]

গণতান্ত্রিক সমাজে অর্থনৈতিক সুযোগ–সুবিধা এমনভাবে বিন্যস্ত যে সমাজের সকল শ্রেণী বা গ্রুপ জীবনের সর্বনিম্ন প্রয়োজন সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছে। ধনী–নির্ধন, বড়–ছোটর মধ্যে ব্যবধান রয়েছে বটে, কিন্তু জীবনযাত্রার ন্যূনতম প্রয়োজন সম্পর্কে জনসমষ্টির বৃহত্তর অংশ নিশ্চিত হয়েছে। গণতান্ত্রিক সমাজে কাউকে মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য হতে হয় না। এদিক থেকে বলা যায়, গণতন্ত্রের সাফল্যের মূলে যে সব শর্ত অপরিহার্য তার অধিকাংশই সামাজিক। প্রকৃতপক্ষে, পাশ্চাত্যে গণতন্ত্রের উদ্ভব

হয়েছে প্রথমে সামাজিক ব্যবস্থা রূপে। বহুদিনের পরীক্ষা–নিরীক্ষার পর সমাজ থেকে গণতন্ত্রের উত্তরণ ঘটে রাজনৈতিক ব্যবস্থায়।

বাংলাদেশে কিন্তু গণতন্ত্রের প্রয়োগ হয়েছে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, যদিও এ সমাজে বিদ্যমান রয়েছে অসহনীয় অসাম্য, নির্মম বঞ্চনা, ব্যক্তি এবং শ্রেণীর মধ্যে অসম ব্যবধান, উঁচু–নিচুর মধ্যে অসহনীয় পার্থক্য। বাংলাদেশ সমাজে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ এখনও হয়নি। এ সমাজে এখনও সূচিত হয়নি আইনের প্রতি আনুগত্য। কোন কিছু পেতে হলে এখনও ব্যক্তি তাকায় ব্যক্তির দিকে। আইনের দিকে নয়। সহনশীলতা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এসমাজে এখনও অত্যন্ত দুর্লভ গুণ। এ প্রেক্ষিতে, বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সম্ভাবনা সম্পর্কে গবেষণা যে অত্যন্ত জটিল তা সহেজেই অনুমান করা যায়।

সুশাসন এবং স্বশাসন স্থিতিশীল করার ক্ষেত্রে একটি জাতির জন্যে খুব বেশী সুযোগ আসে না। একবার এসেছিল, মুক্তিযুদ্ধের পর, ১৯৭২ সালে। এ জাতি তা ধারণ করতে সক্ষম হয়নি। আর একবার এসেছে, স্বৈরাচারের পতনের পর, ঠিক বিশ পছর পরে ১৯৯১–এ। জনসমষ্টির আশা–আকাঙ্ক্ষা ধারণ করে জাতীয় নেতৃত্ব অগ্রসর হলে পাহাড়প্রমাণ প্রতিবন্ধকও মাথা নোয়ায়। কিন্তু এজন্যে জাতীয় নেতৃত্বের যেভাবে সুসজ্জিত হতে হয়, তা কি সম্পন্ন হয়েছে? গবেষকদের সৃষ্টিধর্মী উদ্যোগে বাংলাদেশ সমাজ, সংস্কৃতি এবং রাজনীতির সব গ্রন্থি উন্মোচিত হোক।

তথ্য নির্দেশ

১. Francis Fukuyama, "The End of History", *The National Interest* (Summer, 1989).

২. Stephen P. Cohen, *Arms and Politics In Bangladesh, India and Pakistan*, (Buffalo : Council of International Studies, State University of New York, 1973).

৩. বহুসংখ্যক প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ Emajuddin Ahamed, *Military Rule and Myth of Democracy*, (Dhaka : UPL, 1988); Talukder Maniruzzaman, *Military With- drawal from Politics : A Co-oparative Study*, (Dhaka : UPL, 1988); Golam Hossain, *Civil-Military Relations in Bangladesh*, (Dhaka : Academic Publishers, 1991).

৪. দেখুন, Barry Holden, *Understanding Liberal Democracy*, (New York : Philip Allan, 1988)

৫. Aristotle, *The Politics*, Part iv, Para vi

৬. Carl Cohen, *Democracy*, (Athens : University of Georgia Press, 1971)

৭. David Held, *Models of Democracy*, (Stanford : Stanford University press, 1947)

৮. Robert A Dahl, *Dilemmas of Pluralist Democracy: Autonomy VS Control*, (New Haven : Yale University Press, 1982)

৯. Robert A, Dahl, *Democracy and Its Critics*, (New Haven : Yale University Press, 1989)

১০. অধ্যাপক ফিনের এ বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে What is Democrcy শীর্ষক প্রকাশনায়। এটি USIA কর্তৃক ১৯৯১ সালে প্রকাশিত।

১১. *প্রাগুক্ত*

১২. *প্রাগুক্ত*

১৩. *প্রাগুক্ত*

১৪. এমাজউদ্দীন আহমদ, *বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট*, (ঢাকা ঃ ১৯৯১)